নারীশিক্ষা

অথবা, নারীশিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন
অথবা, জাতি গঠনে নারীশিক্ষার গুরুত্ব
অথবা, উপবৃত্তি ও নারীশিক্ষা
অথবা, নারীশিক্ষার গুরুত্ব
অথবা, শিক্ষাই নারীমুক্তির পথ

ভূমিকা: নারী আমাদের সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। শুধু আমাদেরই নয়, বিশ্বসমাজ ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। তাইতো কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণ কর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পুরুষশাসিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা নারীর প্রকৃত বিকাশকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলছে যুগের পর যুগ ধরে। পুরুষের বৈরী মনোভাব এবং ভোগবিলাসী আচরণের শিকার হয়েছে বহু নারী। এর পরেও নারীরা নীরবে পালন করে চলেছে তাদের সামাজিক দায়িত্ব। তবে সবকিছুর পরেও বলতে হয় নারীসমাজ যুগে যুগে সভ্যতার কষাঘাতে জর্জরিত এক অতি করুণ সেলুলয়েড চিত্র।

নারীশিক্ষার আদি কথা: নারীশিক্ষা সম্পর্কে অনেক কথা প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। আমরা আমাদের দেশে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত মাতৃতান্ত্রিক পরিবার খুঁজে পাই। এসব সমাজে নারীদের প্রাধান্য সবসময় পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রাচীন সাহিত্যেও নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ

সাহিত্যেও শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নারীকে আবার চার দেয়ালের ভিতরে বন্দী করে রাখা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নারীদের স্বতত মর্যাদা স্বীকৃত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে নারীশিক্ষার সূচনা ও প্রসার ঘটে। এ সময়ে নারীরা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করতে শুরু করে। নারী-পুরুষের সমান অধিকার, নারীর শিক্ষার অধিকার, আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি তাঁদের মাধ্যমেই বাংলার নারী শিক্ষার সূচনা হয়। মুসলিম নারী সমাজকে জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এছাড়া বেগম সুফিয়া কামাল, ফজিলাতুননেসা, বেগম শামসুন নাহারও নারীর উন্নয়নে অনেক অবদান রাখেন। নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সাথে সাথে নারীদের আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তেমনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইডেন কলেজ, হলিক্রস কলেজ, বেগম রোকেয়া কলেজ উল্লেখযোগ্য।

নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে রোকেয়া: নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল অগ্রণী। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে নারীশিক্ষার সূচনা হয়। আর রোকেয়া মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলোর মশাল জ্বালাতে সহায়তা করেছেন। তৎকালীন সময়ে নীরবতা, বিশেষ করে মুসলমান নারীরা অশিক্ষা, কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তারা কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দী ছিল। তাদেরকে বাড়ির চার দেয়াল ও পর্দার আড়ালে থাকতে হতো সব সময়। রোকেয়া এ অবস্থা থেকে নারীদের বের হয়ে আসার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। নারীদের দূরবস্থা, অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার জন্য তিনি শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি ১৯০৯ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নারীদের সামগ্রিক মুক্তির জন্য নারীশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নারীশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনাও করেছেন।

নারীর অনগ্রসরতা: নারীসমাজ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই অবহেলিত। যদিও স্বাধীনতাত্তোরকালে এর কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তথাপি বলতে হয় এ দেশে নারীর মর্যাদা এখনও ভূলুন্ঠিত। আর নারীর এ অনগ্রসরতার মূল কারণই হলো শিক্ষার অভাব। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নারী জাগরণমূলক প্রবন্ধ 'জাগো গো ভগিনী' তে লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাই নারী জাগরণের মূলমন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নারীর প্রকৃত শিক্ষাকে। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই একজন নারীর অনগ্রসরতা দূর করে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারে।

নারীর প্রকৃত অবস্থা: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বলেছিলেন, 'স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রসস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাল, ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল এক সময়কার নারী সমাজের চিত্র। তবে বর্তমানে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এ কথা যেমন স্বীকার করতে হয়, অনুরূপ এ কথাও বলতে হয় যে নারীশিক্ষার ওপর আরো গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে নারীশিক্ষা: প্রাচীন আমলেও নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল। ইসলাম ধর্মই প্রথম নারীর পূর্ণ অধিকার এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করে। তবে কিছু মুসলমান ব্যক্তির কঠোর কঠোর পর্দাপ্রথায় নারীর অধ্যয়নের পথ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। যদিও পর্দাপ্রথা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু শিক্ষার্জনকে ইসলাম কখনো বাধা দেয়নি বরং শিক্ষার্জনের ওপর ইসলাম জোর দিয়েছে। প্রাচীনকালের নারীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য দুটি উদাহরণ মোগল রমণী গুলবদন এবং জেবুন্নিসা।

ইংরেজ আমলে নারীশিক্ষা: এ দেশে ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত এবং প্রসারিত হওয়ার পর আমাদের সমাজব্যবস্থা ও জীবনাদর্শে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর জীবনধারাও এতে প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের সমাজে নারীর গতিবিধির গণ্ডি তখন ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। তবে নারীশিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। বিংশ শতাব্দীতে এর বিকাশ ঘটে। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নারীশিক্ষা এখন যৌবনে পদার্পণ করেছে।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা: নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত ব্যাপক তা ভাষায় বোঝানো কঠিন। একজন সুশিক্ষিত মা-ই দিতে পারে সুন্দর সমাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রভাব সম্বন্ধে নেপোলিয়নের যথার্থ উক্তি- 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।"

তাছাড়া গৃহস্থালি কাজ থেকে শুরু করে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য চাই শিক্ষা। কর্মজীবনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর স্থান নিশ্চিত হলে সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এজন্য সবার আগে দরকার শিক্ষার আলো। নারীশিক্ষার প্রভাবে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হতে বাধ্য। সর্বোপরি নারীশিক্ষাই একটি পরিবারকে পূর্ণ স্বাবলম্বী করে তুলতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্বাবলম্বী হতে নারীশিক্ষা: স্বাবলম্বী হতে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একসময় স্বামীরা উপার্জন করত আর নারীরা রান্নাবান্না করত। নারীরা তাদের সবকিছুর জন্য স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে নারী শিক্ষিত হয়ে উপার্জনে অংশ নিচ্ছে। পুরুষের পাশাপাশি তারাও সংসারে সাহায্য করছে। নারীরা বর্তমানে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অবদান রাখছে। তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী, ব্যাংকার, পুলিশ সব পেশাতেই যুক্ত হচ্ছে। এভাবে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছে। আর স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা।

গৃহস্থালি কাজে নারীশিক্ষা: গৃহস্থালি কাজেও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষিত নারীরা তাদের সংসার সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। তারা সংসারের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারে। সন্তানকে সঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারে। সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে পারে। এ কাজগুলো একজন শিক্ষিত নারী যেভাবে পরিচালনা করতে পারে, একজন অশিক্ষিত নারী সেভাবে পরিচালনা করতে পারে না। এজন্য নারীকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। তবেই একটি সুন্দর সমাজ ও দেশ আমরা গড়তে পারব।

দেশ গড়তে নারীশিক্ষা: দেশ গড়তেও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশ গড়ার পেছনে নারীদের ভূমিকাও অনেক। বর্তমানেও নারীরা দেশ গঠনে ভূমিকা রেখে চলেছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি আন্দোলনে নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে ও আন্দোলনে। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীরা অংশগ্রহণ করেছে। পরোক্ষভাবেও তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করেছে। আর শিক্ষিত নারীরাই সবসময় এগিয়ে এসেছিল, বর্তমানেও আসছে। তাই দেশ গঠনেও নারীশিক্ষার গুরুত্ব অনেক।

নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারি পদক্ষেপ: একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নারীশিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। নারীশিক্ষা দ্বারা নারী জাতিকে উন্নত করতে না পারলে একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সরকার নারীশিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার এখন মহিলাবিষয়ক বিভাগ খুলেছে। এটি এখন একটি মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। নারীশিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করেছে। তাছাড়া নারীদের জন্য জেলাভিত্তিক আসন সক্রিয় করে রাখা হয়েছে। কোটা সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকার নারীশিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপবৃত্তি: গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের সাধারণত দরিদ্রতার কারণে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাসের পর বিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নারীশিক্ষা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এজন্যই শহরের বাইরে মেয়েদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। আর এটা গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

বেসরকারি পদক্ষেপ: এখন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নারীশিক্ষার উন্নয়নে এগিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ইউনিভার্সিটি অব উইমেন্স ফেডারেশন, উইমেন্স ভলান্টারি এসোসিয়েশন, ঢাকা বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব ইত্যাদি সংগঠন নারীদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। তারা নারীশিক্ষার বিস্তারেও কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও এখন নারীশিক্ষা বিস্তার ও তাদের সাহায্য সহযোগিতায় কাজ করছে।

নারীশিক্ষা- প্রেক্ষিত বাংলাদেশ: নারীশিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ সরকার খুবই তৎপর। কারণ দেরিতে হলেও এদেশের কর্ণধারগণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে শিক্ষাই নারীমুক্তির একমাত্র পথ। তাই তারা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার নারীশিক্ষার প্রসারে স্কুল পর্যায়ে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি চালু করেছে। তাছাড়া দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদেরকে অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো পদক্ষেপ গৃহীত হবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার: নারী ও পুরুষ উভয়েই এ সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে অন্ধকারে রেখে সুশীল সমাজের স্বপ্ন দেখা অর্বাচীনতার নামান্তর। তাই নারীশিক্ষাকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। আর তা যদি না হয় তবে আলেয়াকে

আমরা আলো বলে ভুল করব, এতেই ঘটবে আমাদের জাতীয় জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত আত্মিক অপমৃত্যু।